গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ১১ - ১৭ মে, ২০১২ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

আর্থিক ‘সংস্কারের’ ভাঁওতায় জনগণ বারবার ভুলবে না

ঘটনাগুলো প্রায় একই সঙ্গে পরপর ঘটে গেল।

যোগ আছে কি একটার সঙ্গে আর একটার? যোগ করে দেখলে কি কিছু বেরিয়ে আসে?

১৮ এপ্রিল আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় ভারত সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৌশিক বসু বললেন, ‘জোট রাজনীতির গেরোতেই আটকে রয়েছে ভারতের আর্থিক সংস্কার এবং এই কারণেই এই সরকারের আর কিছু করার জো নেই।’ অর্থাৎ জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতাতেই আটকে যাচ্ছে সরকারের সংস্কার কর্মসূচি।

তার কয়েক দিন আগেই ভারতে ব্যবসারত মার্কিন কর্পোরেট সংস্থাগুলির সংগঠন ‘ইউ এস-ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল’ হোয়াইট হাউসের কাছে একটি নোট পাঠিয়ে বলেছে, ভারতের আঞ্চলিক নেতানেত্রীদের গুরুত্ব যত বাড়ছে, ততই শূন্যতা তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রে। সংস্কারের সিদ্ধান্তে সরকার দ্বিধায় ভুগছে।

১৮ এপ্রিলই আই এম এফ ঘোষণা করেছে, বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য হারে পৌঁছতে হলে ভারতকে অর্থনৈতিক সংস্কারে গতি আনতে হবে। তেল, সারের মূল্যবৃদ্ধি এবং জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে ট্যাক্সবৃদ্ধির উপদেশ দিয়েছে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিনিয়োগের পথনির্দেশক এই সংস্থাটি।

২৪ এপ্রিল দুটি মার্কিন মূল্যায়ন সংস্থা ‘স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর্স’ ও ‘মুডিজ অ্যানালিটিকস’ ভারতীয় অর্থনীতির ‘দুরবস্থা’র কথা ঘোষণা করল। প্রথমটি তাদের মূল্যায়নে ভারতীয় অর্থনীতিকে ‘স্থিতিশীল’ থেকে নামিয়ে ‘নেতিবাচক’ বলেছে। দ্বিতীয় সংস্থাটি এই ‘দুরবস্থা’র জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতৃত্বকে দায়ী করেছে। কারণ, সরকারে থাকা অন্যান্য দলগুলিকে সহমতে এনে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার কারণেই নাকি ভারতে আর্থিক সংস্কার থমকে গেছে।

এর পরেই দেখা গেল, দেশজুড়ে সংবাদমাধ্যম, সরকারি প্রসাদপুষ্ট অর্থনীতিবিদ, প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী সহ নানা স্তরের কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা একেবারে গেল গেল রব তুলে দিলেন। শোরগোল উঠল, সংস্কারের গতি আটকে যাওয়াতেই দেশের উন্নয়ন তথা বৃদ্ধি আটকে গেছে। এই দেখুন, কৌশিক বসু কী বলছেন, এই দেখুন মার্কিন মূল্যায়ন সংস্থাগুলি, আই এম এফ কী বলছে? এর পরেও যারা সংস্কারের বিরোধিতা করে তারা কি দেশের আর্থিক উন্নয়ন চায়, দেশের গরিব মানুষের ভালো চায়? তারা আসলে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য ভেবে ভেবে এই মার্কিন মূল্যায়ন সংস্থাগুলির, আই এম এফ কর্তাদের রাতে ঘুম হচ্ছে না। এই যে ‘সব শেয়ালের এক রা’-র মতো সব ক’টি বক্তব্যেরই এক সুর— অবিলম্বে সংস্কারের গতি বাড়াও— এ কি এমনি এমনি, নাকি এদের কথার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু কোন সংস্কার আটকে গেছে, যার জন্য এত হইচই?

না, আটকে গেছে আর্থিক সংস্কার। যেমন, বহু ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নির দরজা খোলেনি। প্রতিরক্ষায় আজও বিদেশি বিনিয়োগ আসেনি। বিমা ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র সংস্কার করে আরও খুলে দেওয়া যায়নি। পণ্য-পরিষেবা কর ও প্রত্যক্ষ কর বিধি চালু হয়নি ইত্যাদি।

এই ‘সংস্কার’ কথাটার অর্থই বা কী?

আসলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও সরকারি ক্ষেত্রগুলি, যেমন খনি, নদী, জঙ্গল, কলকারখানা, শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহণ, পরিষেবা প্রভৃতি সব কিছুকে পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়াকে বেসরকারিকরণ না বলে ‘সংস্কার’ বলার মধ্যেই একটা ধূর্ততা রয়েছে। মানুষকে ঠকাবার কৌশল রয়েছে। সাধারণ ভাবে সংস্কার বলতে আমরা বুঝি, জীর্ণ, ভাঙাচোরা কোনও কিছুকে মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। তাই সামাজিক বা আর্থিক সংস্কার মানে শোষণ লুণ্ঠন নিপীড়ন বৈষম্যে ভরা এই পুরাতন জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে সংস্কার করে এই সামাজিক ব্যাধিগুলি কমানোর কথাই বোঝায়। অথচ বাস্তবে সংস্কার এই জীর্ণতাকে বাড়িয়েই তুলছে। সংস্কারের নামে তারা আজ যা করছে তা হল, শিল্প-কৃষি-শিক্ষা-চিকিৎসা-পরিষেবা সহ নানা ক্ষেত্রে সরকারি যে নিয়ন্ত্রণ এতদিন চালু ছিল, তা শিথিল অথবা বাতিল করে দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের দরজা অবাধ করে দেওয়া। তার জন্য নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন বদলানো। এরই নাম দেওয়া হয়েছে সংস্কার। এখানে বিদেশি পুঁজি বলতে মূলত মার্কিন পুঁজিই বুঝতে হবে। যেমন খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নির বিষয়টি। ওয়ালমার্টের মতো মার্কিন সংস্থাগুলি বহু ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খোলার অপেক্ষায় ছিল। কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি

ছয়ের পাতায় দেখুন

কংগ্রেস-সিপিএমের মতোই মার্কিন তোষণনীতি নিয়ে চলছে তৃণমূল সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ৬ মে এক বিবৃতিতে বলেন, যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বে বিভিন্ন দেশের জনগণকে লুণ্ঠন করছে, দেশে দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বালাচ্ছে, সম্প্রতি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ইরাক ও লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে, আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, সিরিয়া ও ইরানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে, প্যালেস্টাইনবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইজরায়েলকে মদত দিচ্ছে এবং কিউবা ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে, সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টনকে এ রাজ্যে যে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে সেটা এ দেশের তথা এ রাজ্যের জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী ঐতিহ্যের পরিপন্থী। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ লগ্নিপুঁজি সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উপনীত হয়ে অন্যতম সুপার পাওয়ার হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে দোস্তি করে চলেছে এবং নানা অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি এবং যৌথ মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তারই স্বার্থে এ দেশের সকল বুর্জোয়া দল এবং এ রাজ্যের পূর্বতন কংগ্রেস ও সিপিএম সরকারের ন্যায় তৃণমূল সরকারও একই পথ অনুসরণ করে চলেছে।

আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই তোষণমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করছি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেট পাঁচ গুণ বাড়ানো দরকার

স্বাস্থ্য বাজেট বিতর্কে লোকসভায় এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

স্বাস্থ্যখাতে যে পরিমাণ অর্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে দাবি করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এতই কম যে আমি একে সমর্থন করতে পারছি না। আমি মনে করি, স্বাস্থ্যমন্ত্রক যা চেয়েছে তার পাঁচ গুণ বেশি অর্থ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করা উচিত, যদি স্বাস্থ্য মন্ত্রক সত্যিই বিশ্বাস করে যে, স্বাস্থ্যের অধিকার দেশের জনগণের একটা মৌলিক অধিকার এবং সে জন্যই দেশের ১২০ কোটি জনগণের সুলভে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এটা আমার কথা নয়, ১৯৪০-এর দশকে স্যার জোশেফ ভোরে কমিটি, পঞ্চাশের দশকে মুদালিয়ার কমিটি, ষাটের দশকে কোঠারি কমিশন, এবং পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য জাতীয় পরিকল্পনাকারীরা সকলেরই অভিমত ছিল, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ খাতে জাতীয় বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ বরাদ্দ হওয়া দরকার। এই সভায় অনেক বক্তাই জিডিপির শতাংশ হিসাবে এবং ইউরোপের দেশগুলিতে কোথায় কী পরিমাণ বরাদ্দ করা হয় তার তুলনা টেনেছেন। আমি আপনাদের বলতে পারি যেখানে স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারি ব্যয়ের অংশ পাকিস্তানে ৫১ শতাংশ, ফিলিপিন্সে ৫৫ শতাংশ, বাংলাদেশে ৪২ শতাংশ, সেখানে ভারতে মাত্র ১৭ শতাংশ। আমরা যদি সরকারি ও চিকিৎসা প্রার্থীর ব্যয়কে যোগ করে ধরি তা হলে বিশ্বে ভারতের স্থান হয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম। যদি কেবল সরকারি ব্যয়কে ধরি তবে ভারতের স্থান

ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার মতো পাঁচটি হতদরিদ্র দেশের উপরে। সুতরাং সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে যদি আমরা যথার্থই উন্নত করতে চাই, তবে আমাদের বাজেট বরাদ্দ অবশ্যই আরও পাঁচ গুণ বাড়ানো দরকার।

ভারতে দু’ধরনের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো রয়েছে। ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মানুষরা এখানে আসেন হার্ট সার্জারি, লেজার সার্জারি এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য। কিন্তু বিপুল ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই অ্যাপোলো, রুইয়া হাসপাতাল কিংবা ফর্টিসে যাওয়ার। সুতরাং আমাদের অবশ্যই এআইআইএমএস (এইমস)-এর মতো সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আরও দরকার। এর সাথে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে যদি ভালো করা যায় তা হলে দূর-দূরান্তের মানুষকে এইমসে-ও আসতে হবে না।

দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে যথোপযুক্ত করার জন্য কী কী প্রয়োজন?

তিনটি বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। প্রথমত, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং টার্শিয়ারি কেয়ার হাসপাতালগুলোর ঘরবাড়ি ঠিকভাবে করা দরকার। দ্বিতীয়ত, ওষুধ, অপারেশনের সরঞ্জাম, লিনেন, খাদ্য ইত্যাদি নিয়মিত সরবরাহ করা দরকার। তৃতীয়ত, প্রয়োজন মানবসম্পদ। অর্থাৎ ভালো

দুয়ের পাতায় দেখুন

সি ডি ও তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন

মহাকরণ সহ কলকাতার চারটি সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ অফিস (সি ডি ও) তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ৩০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে মহাকরণে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শুভাশীষ দাস বলেন, ২০৯টির মধ্যে পূর্বতন সরকারের ফেলে রাখা ৭৭টি শূন্যপদের কাজের বোঝা নিয়েও কর্মচারীরা নিষ্ঠার সাথে কাজ করার সাথে সাথে আশা করেছিলেন, বর্তমান সরকার শূন্য পদগুলি পূরণ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ৩২৮৯ এফ-(এইচ)-১০.০৪.১২ আদেশনামায় সমস্ত কাজ সরাসরি ডাক বিভাগের হাতে তুলে দিয়ে সি ডি ও-র সমস্ত কর্মীদের উদ্বৃত্ত করে দেওয়া হল। সমস্ত গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি কর্মীদের দেড়টা থেকে দুটো 'টিফিন টাইম'ও কার্যত থাকছে না। কলকাতাকেন্দ্রিক অফিসগুলিতে কর্মচারীদের সার্ভিস বুক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আদান প্রদানের ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও দীর্ঘসূত্রতা বাড়বে। সি ডি ও-র কর্মীদের চাকরি ও পদোন্নতির অনিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পেল। সংগঠন দাবি করেছে, অবিলম্বে ঐ আদেশনামা প্রত্যাহার করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগ ও কর্মচারী সংগঠনের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক।

গড়িয়ায় উচ্ছেদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং হকারদের জীবন-জীবিকা রক্ষা করেই গড়িয়া স্টেশন রোড এবং সংলগ্ন টালি নালার সংস্কার ও উন্নয়ন করতে হবে, তাঁদের উচ্ছেদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। এই দাবিতে ২৯ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গড়িয়া লোকাল কমিটি আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল গড়িয়া স্টেশন এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলের শেষে গড়িয়া রেল ব্রিজের নিচে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সন্দীপন মহাপাত্র এবং সদস্য কমরেড গোরাচাঁদ হালদার। সৌন্দর্যায়নের নামে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং হকারদের উচ্ছেদ করার সমস্ত প্রচেষ্টা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করার আহ্বান জানান তাঁরা। এছাড়া বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ, সুলভ শৌচাগার স্থাপন, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তা সম্প্রসারণ সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের দাবি জানানো হয়। সভায় উপস্থিত হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে ফুলচাষিদের দাবি মানার আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী

সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের ফুলবাজারগুলির নানা অব্যবস্থা ও ফুলচাষিদের সমস্যার প্রতি রাজ্যের উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতি। ১৬ এপ্রিল জেলার কোলাঘাট, দেঁউলিয়া, পাঁশকুড়া ফুল বাজারগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মল্লিকঘাট ফুলবাজার পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান বিপ্লব মিত্র, সহসভাপতি স্বপন বর্মন, সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সহ ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল। এরপর কোলাঘাট গেস্ট হাউসে প্রতিনিধিদল ও জেলার উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিকের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। মন্ত্রী বলেন, রেলের জায়গায় গড়ে ওঠা কোলাঘাট ফুলবাজারের উন্নয়নের বিষয়ে রেলমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন। এছাড়া তিনি পাঁশকুড়ার বন্ধ হয়ে যাওয়া ফুলের হিমঘর যত দ্রুত সম্ভব চালু করা এবং বাজারটি পরিচালনার জন্য অবিলম্বে নতুন কমিটি গঠনের আশ্বাস দেন।

ভ্রম সংশোধন

- গণদাবীর গত সংখ্যায় প্রকাশিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ২৪ এপ্রিলের ভাষণে একটি তথ্যগত ত্রুটি ছাপা হয়েছে। ভারতের ধনীশ্রেষ্ঠদের সংখ্যা ও সম্পদ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য হচ্ছে, ভারতের প্রথম চারজন ধনী মালিকের সম্পদের পরিমাণই হচ্ছে (মার্চ মাসের হিসাবে) ৯ লক্ষ কোটি টাকা। ভারতের প্রথম মাত্র ১০টি ধনী মালিকপরিবারের মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ভারতে বিলিয়নপতির (৫ হাজার কোটি টাকা ও তার বেশি সম্পদের মালিক) সংখ্যাও বাড়ছে। গোটা বিশ্বের প্রথম ১০ জন ধনীশ্রেষ্ঠের মধ্যে ৪ জন হচ্ছে ভারতীয় পুঁজিপতি।
- মে দিবসের লেখায় ভুলক্রমে 'মালিক শ্রেণির কাছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ' ছাপা হয়েছে, যা হবে 'শ্রমিক শ্রেণির কাছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ'।

ঐ লেখাতেই ভারতে কর্মক্ষম ও নিযুক্ত মানুষের যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তা ঠিক নয়। সরকারি হিসাবে ভারতে ১৭ থেকে ৫৯ বছর পর্যন্ত মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭৫ কোটি। ওয়েবসাইটে এন এস এস ও তথ্য বলে, দেশে বেকারের সংখ্যা মাত্র ৪ কোটি। তাহলে কি বাকি ৭১ কোটি মানুষ কর্মে নিযুক্ত? একথা কেউ বিশ্বাস করবে না বুঝেই 'এমপ্লয়েড' বা কর্মে নিযুক্তর সংখ্যা বলা হয়েছে ৩৮ কোটি । আর, ৪ কোটি বেকার বাদ দিয়ে ৩৩ কোটি মানুষকে ঢোকানো হয়েছে 'ওয়ার্কিং' এবং 'ইনটারেস্টেড টু ওয়ার্ক' (হাস্যকর নামকরণ!) নামে তৈরি করা দুটি আলাদা গোষ্ঠিতে। যারা খুঁটে খায়, ক্ষুধা মেটাতে যা হোক কিছু কাজে নগণ্য মজুরিতে পরিশ্রম করে, আবার অতি অল্প সময়ের জন্য হয়তো কাজ পায়, তারা সকলেই সরকারের এই হিসাবে কর্মে নিযুক্ত অর্থাৎ বেকার নয়। এই চালাকি বাদ দিলে বাস্তবে কর্মহীন মানুষের সংখ্যাটা মোট কর্মক্ষম মানুষের ২০ শতাংশ বা তার বেশি হলেও বিস্ময়ের হবে না। আবার, সরকার নিযুক্ত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে কর্মে নিযুক্ত মোট মানুষের ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ মাত্র ৭ শতাংশ শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত।

এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

কোচবিহারে নানা দাবিতে বিক্ষোভ

জাতীয় হকার নীতি মেনে হকারদের ব্যবসা করতে দিতে হবে, এন বি এস টি সি-র ঠিকা শ্রমিকদের পুনর্বহাল করতে হবে, শহর থেকে রিক্সাস্ট্যান্ড তুলে দেওয়া চলবে না, শহর যানজট মুক্ত করতে যত্রতত্র পার্কিং বন্ধ করতে হবে, পিপিপি মডেল চালু করা চলবে না, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া চলবে না, বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি চলবে না — জনজীবনের এইসব জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১২ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে কোচবিহার জেলা সংগ্রামী হকার্স ইউনিয়ন অংশগ্রহণ করে। প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষের মিছিল কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে। ঐ দিন কোচবিহার শহরে এক হকার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সংগ্রামী হকার্স ইউনিয়ন-এর ৭১ জন সদস্যবিশিষ্ট কোচবিহার জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হন যথাক্রমে প্রভাত রায়, সঞ্জীব চক্রবর্তী ও নির্মল রাউত।

স্বাস্থ্য বাজেট ঃ পশ্চিমবঙ্গে 'এইমস' হাসপাতাল চাই

একের পাতার পর

চিকিৎসক, তার সঙ্গে মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণা। ২০০২ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ আমাদের রয়েছে। সুতরাং শুধুমাত্র এটাকেই একশ শতাংশ করা দরকার। ওষুধ সরবরাহের প্রশ্নে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার একটা রিপোর্ট দেখিয়েছে, এ দেশের জনগণকে তাদের আয়ের ৮০ শতাংশ টাকাই শুধুমাত্র ওষুধ কিনতে ব্যয় করতে হয়। এ প্রশ্নে হাতি কমিটির সুপারিশকে আমাদের অনুসরণ করা দরকার।

এখন, স্বাস্থ্য বাজেট আলোচনায় অন্যান্য সাংসদরা যা বলেছেন, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা আমি বলব, আশা করি আপনি তার সুযোগ দেবেন। ১৯৭৫ সালে হাতি কমিটি দু'টো প্রধান সুপারিশ করেছিল। একটা ছিল, সমস্ত চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশনে ওষুধের জেনেরিক নাম লিখতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ করতে হবে।

১৯৮০-র দশকে ওষুধ উৎপাদনে আমরা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু বিশ্বায়ন এবং উদারনীতিবাদ গ্রহণ করার পর পেটেন্ট ব্যবস্থা বদলে দিয়ে স্বনির্ভরতার নীতিকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পেটেন্ট ব্যবস্থার কল্যাণে ওষুধের দাম ক্রমাগত আকাশছোঁয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রক জনঔষধি নামে একটি সুন্দর প্রকল্প নিয়েছে এবং ওষুধের জেনেরিক নাম লেখার ব্যবস্থাটাও অত্যন্ত ভালো পদক্ষেপ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, আমার রাজ্যে এর বাস্তব চিত্রটা খুবই খারাপ। আমার নিজের রাজ্যে মাত্র দুটি জনঔষধি স্টোর্স আছে। সেখানে আমার নিজের অসুখের জন্যও জেনেরিক ওষুধ চাইতে গিয়ে দেখেছি প্রয়োজনের পাঁচ শতাংশ ওষুধও সেখানে নেই। মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আমার আবেদন তিনি যেন এ দিকটায় নজর দেন।

ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে সত্য-মিথ্যায় মেশানো কিছু কথা প্রচারিত আছে। সরকারের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, এ দেশে গ্রামীণ ক্ষেত্র এবং জাতীয় ক্ষেত্রের জন্য কতটা ব্যয়বরাদ্দ সরকার স্থির করেছে। আয়ুশ, হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথি মিলে দেশে মোট ২৪ লক্ষ ডাক্তার আছেন। জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি এক হাজার মানুষ পিছু এক জন ডাক্তার আছেন। এই অবস্থায় 'দ্রুত আরও ডাক্তার চাই' এই শোরগোল না তুলে সরকারকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে তারা কি এই সকল ডাক্তারকে নিযুক্ত করার মতো পরিকাঠামো ও ওষুধ সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা করেছে? মূল প্রশ্নটা এখানে তাই প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থার। 'আশা' কর্মীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যদের বক্তব্যকে আমি সমর্থন করি। এদের নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে ঘোষণা করা উচিত এবং মাসিক বেতন সাত হাজার টাকা হওয়া উচিত।

এখন আমার রাজ্যের জন্য আমি কিছু দাবি রাখতে চাই। স্বাস্থ্যমন্ত্রক উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে এইমসের মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আজও তা কার্যকর করা হয়নি। আমি জানি না তার কারণ কী। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি অনুরোধ করব। দ্বিতীয়ত, কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউট একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কলকাতার একটি অত্যন্ত জনবহুল এলাকায় এটি অবস্থিত, একে স্থানান্তরিত করা দরকার। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সবরকম সহায়তা দেবে।

পরিশেষে আমি যে কলেজ থেকে ডাক্তার হয়েছি সেই কলকাতা মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে একটি আবেদন জানাব। এটি এশিয়ার সব থেকে প্রাচীন মেডিকেল কলেজ, এখানেই প্রথম মানবদেহের ব্যবচ্ছেদ করা হয় এবং এশিয়ার প্রথম মহিলা চিকিৎসকও এই কলেজেরই ছাত্রী ছিলেন। সুতরাং কলকাতা মেডিকেল কলেজ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাওয়ার দাবি রাখে এবং সে জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে এই কলেজের উন্নয়নে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা দরকার।

দেশের সম্পদ জনগণের নয়, ঋণটা জনগণের, মেটাবার দায়ও তাদের

সম্প্রতি দশম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, ২০১১-'১২ আর্থিক বছরে দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার নেমে আসবে ৭ শতাংশে। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন আর্থিক বৃদ্ধির হার গত বছর ৮.৫ শতাংশ ছিল। এবার কমে হবে ৭.৫ শতাংশ। তবে প্রধানমন্ত্রীর আশা, কয়েক বছরের মধ্যে বৃদ্ধির হার ৯-১০ শতাংশ পৌঁছে যাবে। তাঁর এই আশার একটা ভিত্তিও নাকি আছে। তাঁর আবেদন— চিরাচরিত ক্ষেত্র নয়, সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে।

বণিক সভা ফিকি এবং অ্যাসোচেম প্রস্তাব দিয়েছে, আর্থিক অগ্রগতি বজায় রাখতে এক) বিদেশ থেকে কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য টাকার মালিকদের 'সুবিধা প্রকল্প' ঘোষণা করা দরকার। কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি চললে অনিয়ন্ত্রিত টাকার বিপুল জোগান বাজারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে। দুই) বিদ্যুৎ ও ইস্পাত শিল্পে জোর দেওয়ার জন্য কয়লাখনির বেসরকারিকরণ করতে হবে। তিন) স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে ১০-১৫ বছরের জন্য শিল্পপতিদের 'ট্যাক্স হলিডে' বা ট্যাক্স ছাড়ের সুযোগ দিতে হবে। চার) শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে আলাদা জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করতে হবে। পাঁচ) কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। দেখা যাচ্ছে, বণিক সভাগুলোর এই চাহিদা ও পরিকল্পনার সঙ্গে সরকারের বক্তব্য মিলে যাচ্ছে।

এবার দেখা যাক, খোদ প্ল্যানিং কমিশনের লক্ষ্য কী। কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া কেরালায় এক সেমিনারে প্ল্যানিং কমিশনের মূল দৃষ্টিভঙ্গিগত দলিল বা অ্যাপ্রোচ পেপারে বলেছেন, 'ভর্তুকি বৃদ্ধি ছাঁটাই' করতে হবে। এই তাঁর ঘোষণা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বক্তব্যে ব্যাপারটা আরও খোলামেলা হয়ে যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শ হল ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসে সরকারি ভর্তুকি সম্পূর্ণ বিদায় করে এগুলোর দামের ওঠা-পড়া বাজারের ওপর ছাড়তে হবে। বলা হচ্ছে, এই যে নয় মাসেই ১৩৩ বিলিয়ন ডলার বাজেট ঘাটতি হচ্ছে, তার বড় কারণ এই ভর্তুকি। বেশ বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যাঙ্কের আরও যুক্তি, এবার খাদ্য সুরক্ষা বিল আনা হচ্ছে। প্রণববাবুর মতে এজন্য ১ লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি লাগবে। সুতরাং বোঝা কমাতে হবে সরকারকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর এক পদক্ষেপ হল — ক্যাশ রিজার্ভ রেসিও (রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের জমার বাধ্যতামূলক হার) ৬ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশ কমিয়ে বাজারে ৩২ হাজার কোটি টাকার জোগান দেওয়া। অবশ্য স্বল্পমেয়াদী ঋণে (রেপো রেট) সুদ ৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের অভিমত, গত বাজেটে ঘাটতির অঙ্কের হিসেব বেড়ে প্রকৃত ঘাটতি হবে অনেক অনেক বেশি।

অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কের এই পদক্ষেপে খুশি নন। তাঁর দুঃখ 'ভর্তুকির কথা ভাবলে আমার রাতে ঘুম হয় না' (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৫-১-১২)। ভয় হয়, অনিদ্রা রোগ স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি করে কিনা!

প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭ বা ৭.৫ শতাংশ যাই বলুন, আমজনতার তাতে কিছু এসে যায় না। বৃদ্ধির হার কমার পর আবার যদি বেড়ে ১০ শতাংশ হয়, জনতার তাতেও কিছু উপকার নেই। এইসব জি ডি পি বৃদ্ধির এগোনো বা পিছোনোটা জনস্বার্থের সাথে সম্পর্করহিত। জিডিপি কিছুদিন আগে ৯.৪ শতাংশ যখন ছিল, তাতে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কমেনি, বরং বেড়েছে। কর্মসংস্থানের হারও অত্যন্ত কমেছে। শেয়ার বাজারে লগ্নি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়ে না। মর্গ্যান স্ট্যানলির সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০০৩-'০৭ পর্যন্ত চার বছরে ১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার শেয়ারে বিনিয়োগ হলেও দেশে বেকার বেড়েছে ১ কোটি।

২০০৮-এ মন্দার সময় ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয় যার পোশাকি নাম 'স্টিমুলাস প্যাকেজ'। চার বছর ধরে এই প্যাকেজ ৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বিদায়ী আর্থিক বছরে প্রত্যক্ষ কর অনাদায়ী থাকল ৪০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া প্রত্যক্ষ কর কমানো হয়েছিল ১১,৫০০ কোটি টাকা। আর পরোক্ষ কর যা দেয় মূলত সাধারণ মানুষ, তা বাড়ানো হয়েছিল ১১,৩০০ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক ও পরিষেবা কর কমানোয় সরকারি আয় কমে গিয়েছিল ৩৫ হাজার কোটি টাকা। কর্পোরেট সারচার্জ কমানো হল ২.৫ শতাংশ। এইভাবে পুঁজিপতিদের জন্য দানছত্র খুলে দিয়ে সরকারের যে আয় ঘাটতি হল তা পোষানো হল খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা থেকে ৬৪০৭.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ কমিয়ে, আর ২৩ কোটি টাকা ভর্তুকি ছাটাই করে। এর সাথে যুক্ত হল সরকারি শেয়ার বেচে ৪০ হাজার কোটি টাকা আয় করা ও ১৫ হাজার কোটি টাকার বাড়তি নোট ছাপানো। এর ফল হল, বিপুল মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির ভয়াবহতা।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্র ৬ হাজার কোটি টাকা মূলধন দেবে এই ঘোষণা ছিল। হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই মূলধন কোথায় উড়ে গেল? এই ঘাটতির কারণ মূলত শিল্পপতিদের নেওয়া লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল অনাদায়ী ঋণ। এর নাম অবশ্য ভর্তুকি নয় — সহায়তা! এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপুল সাব-প্রাইম লোন, যা ব্যাঙ্ক বিলিয়েছে, গাড়ি, বাড়ি, যেকোনও ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের জন্য ঋণ হিসাবে। মধ্যবিত্তের একাংশ এই টাকা খরচ করেছে দেদার। শহর ও গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দৈনিক ১৫-২০ টাকার বেশি খরচ করার ক্ষমতা নেই। ফলে বাজার মন্দা। এভাবে ঋণ দিয়ে কৃত্রিম পথে চাকুরিজীবী, আমলা, ব্যবসাদারদের মতো নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে সংকটের মধ্যেও বাজার তেজি রাখা হচ্ছে। ভোগ্যপণ্যের কাটতি বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তাই এই ঋণ নির্ভর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মন্দা জর্জরিত বাজার অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাপান, জার্মানি, গ্রিস, স্পেন, পর্তুগাল, ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশ এই ঋণ সংকটের ঘূর্ণাবর্তে বিধ্বস্ত। ব্যাঙ্কের পদক্ষেপও এখানে নির্দিষ্ট— একবার সি আর আর হেরফের করা, আর রেপো রেট হেরফের করা— অনেকটা লেফট-রাইট প্যারেডের মতো।

এই ভর্তুকির জন্য অর্থমন্ত্রীর ঘুমের কোনও সমস্যা হয় কি? ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আই এম এফ)-এর প্রাক্তন প্রধান অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজন কয়েক বছর আগে বলেছিলেন, ভারত এগোচ্ছে অলিগার্কির দিকে। একটা ছোট্ট গোষ্ঠী দেশকে চালাচ্ছে। সে সময় দেশে বিলিওনেয়ারের সংখ্যা জার্মানির সমান। দেশের জাতীয় উৎপাদনের ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার আসে এদের কাছ থেকে (৫৫ জন)। অথচ জার্মানির মোট জাতীয় উৎপাদন ভারতের ৩ গুণ এবং মাথাপিছু আয় ৪০ গুণ (বর্তমান ১৮-২-১২, রঞ্জন সেন)। আই এম এফ কর্তা এমন বললেও আসলে বাস্তবটা হল ভারত বহু পূর্বেই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছে। শিল্পপুঁজি ও ব্যাঙ্কপুঁজির অলিগার্কি গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র তার সেবাদাস। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু পূর্বেই তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এই অলিগার্কির আবদার বা ইচ্ছা যাই বলা হোক না কেন, সেটাই সরকারের নীতি নির্ধারণ করে। উদারনীতির উদারতাই জন্ম দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোটি কালো টাকার। প্রণববাবুদের হাতে ৩৬ হাজার তথ্য থাকলেও অলিগার্কির রাজনৈতিক চাকর-বাকররা সেখানে হাত দিতে পারে না।

আমেরিকা-ব্রিটেন-ভারত-চিন সহ সব পুঁজিবাদী দেশই সামরিক খাতে ব্যয় বাড়াচ্ছে যা বাজেটে সর্বাধিক। সামরিক ব্যয় ভারতে ৩১.৯ বিলিয়ন ডলার, চিনে ১০৬ বিলিয়ন ডলার। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের সাথে এই ব্যয়ের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। যুদ্ধবাজ সব দেশের, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের, আমজনতার রক্তমোক্ষণ করে এই অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা ও অস্ত্র ব্যবসা চলছে। আমেরিকা-ব্রিটেনের মতো দেশের তো যুদ্ধব্যবসা একটা প্রধান ব্যবসা। আমেরিকার মিলিটারি বাজেট ৭৩৯ বিলিয়ন ডলার, ব্রিটেনের ৬৩ বিলিয়ন ডলার। এর খরচ মেটাতে সেখানকার মানুষ হচ্ছে নিঃস্ব রিক্ত। সরকারের আয় যে কমছে ও ব্যয় বাড়ছে, ঘাটতি হচ্ছে, তা হচ্ছে মূলত এই তিনটি কারণে। সাধারণ মানুষের সুযোগ সুবিধা অধিকার নিরাপত্তা ধ্বংস করে অর্থ যাচ্ছে অপচয়ের পথে। এই সমর অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত বাজার অর্থনীতিকে সাময়িক ও কৃত্রিমভাবে চাঙ্গা করে। সামরিক উৎপাদনগুলি মানুষ কেনে না। কাজেই তাদের ক্রয়ক্ষমতার সাথে অস্ত্র-বাজারের সম্পর্ক নেই। ঘাটতি বাজেট আজ সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ঘাটতির জন্য করা হচ্ছে ঋণ। ঋণ মানে দায় চাপছে সুদের। বোঝা বাড়ছে মানুষের ওপর। এই ঋণের সুদও ঘাটতি বাড়াচ্ছে। সুতরাং সরকারি ঋণের পর্বতপ্রমাণ বোঝাও সাধারণ চরিত্র হিসাবে এসেছে। আর অস্ত্র খালাস করার জন্যই এসেছে যুদ্ধ-আগ্রাসন। অর্থনীতির বিচারে তা যুদ্ধব্যবসা। ছোট বড়, আঞ্চলিক, সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। তার খরচ জোগাতে জনসাধারণ ফতুর — কিন্তু মুষ্টিমেয় বৃহৎ ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা ও পরিপূরক শিল্পগোষ্ঠী মুনাফার পাহাড় বানাচ্ছে। সুতরাং জনতার ক্রয়ক্ষমতার অবনমনের গতি অব্যাহত। এভাবে ধনী গরিবের আয় বৈষম্যও অতীতের সব রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। সংকুচিত বাজার থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা তোলার গ্যারান্টার হিসাবে রাষ্ট্র নগ্নভূমিকায় অবতীর্ণ। ভারতের মতো দেশে বেপরোয়াভাবে আজ কালো টাকা সাদা করার জন্য দেশদ্রোহী ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবও তোলা হচ্ছে। দুনিয়ার বুকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থাকার সময়ে সমাজতন্ত্রের প্রভাব ঠেকাতে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের রূপে পুঁজিবাদ তার লুণ্ঠনকে চালিয়ে যাওয়ার পথে জনতার কিছু ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা, সুযোগ সুবিধা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার যেটুকু সুযোগ দিয়েছিল মানবিক ভেকধারণ করতে, আজ আর তারও প্রয়োজন নেই। বিশ্বায়ন লুণ্ঠন উদারভাবে চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্থায়ী মন্দার মধ্যেও আপেক্ষিক অর্থে বাজার যা ছিল, বর্তমানে বাজার সংকট তথা মন্দা অতীতের সব নজির ছাড়িয়ে গিয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা এই মন্দার নিরসন সম্ভব বললেও তা বেড়েই চলেছে। অনিরসনীয় এই সংকটের আবর্তেই দুনিয়ার পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি কম্পমান। তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতও বিপর্যস্ত।

আমেরিকার কথাই ধরা যাক। ১৯৯৩-২০০৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয় বৃদ্ধির অর্ধেকটাই গেছে ধনী ১ শতাংশের পকেটে। বুশ জমানায় ১ শতাংশ ধনী দখল করেছে জাতীয় আয়ের ৭৫ শতাংশ। ধনীর ওপর করের বোঝা কমেছে। আয় বৈষম্য বেড়েছে ব্যাপক। আমেরিকার বেকারত্ব ১০ শতাংশ হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেকারির গড় ৯.২ শতাংশ। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি বেকারের তালিকা তৈরিতে সেয়ানা। তাদের হিসেবে, পার্টটাইম কাজ করলে বা সপ্তাহে একঘণ্টা কাজ পেলেও সে বেকার নয়। ২০০৯ সালে আমেরিকায় পার্ট টাইম কর্মীর সংখ্যা ছিল ৮৮ লক্ষ। আর যারা নাম কা ওয়াস্তে চাকরিজীবী (মার্জিনালি অ্যাটাচড ওয়ার্কার), এদের সংখ্যা ২২ লক্ষ। আমেরিকানরা গৃহঋণ শোধ করতে আয়ের ১৪ শতাংশ ব্যয় করতে বাধ্য হয় যেখানে খাওয়া পরায় আয়ের ১৩ শতাংশের বেশি ব্যয় করতে পারে না।

আমেরিকার মোট ঋণের পরিমাণ সারা দুনিয়ায় সকল দেশের জি ডি পির যোগফলের সমান। এর ফলে আমেরিকার অর্থনৈতিক ভূমিকম্পের খবর তো সবাই জানে। সেখানে শিল্পপতিদের রক্ষা করতে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। একইভাবে ব্রিটেন, জাপান, ইতালি সহ সকল দেশ পুঁজিপতিদের ভর্তুকি দিয়েছে। আর 'শক্তপোক্ত' চীন ও ভারত যাদের মডেল বানানো হচ্ছে মিথ্যাচার করে, সেই চীন ভর্তুকি দিয়েছে জিডিপি-র ৩.৬ শতাংশ আর ভারত দিয়েছে ৩.৫ শতাংশ। মন্দার ধাক্কায় ভারতে শুধু টেক্সটাইল ক্ষেত্রেই কাজ হারিয়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ (২০০৮-০৯)। চীনকে বলা হয় 'দুনিয়ার (তথাকথিত) ওয়ার্কশপ'। এখানে রপ্তানি নির্ভর বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে ২ কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, যা চীনের শ্রমশক্তির ১৫ শতাংশ। পিপলস ব্যাঙ্ক অব চায়নার মুখপত্র বলছে, চীনে খেলনা শিল্পের অর্ধেকই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ২০০৮ সালে। পার্টটাইম শ্রমিকদের সংখ্যা আমেরিকায় হয়েছে দ্বিগুণ, ৪৬ লক্ষ থেকে ৯০ লক্ষ; প্রতি ৬ জনে একজন বেকার, নয়তো নামমাত্র কাজে যুক্ত। আই এল ও-র রিপোর্ট বলছে, ফ্রান্সে কর্মহীনতার হার বাড়ছে ৮.৮ শতাংশ হারে। জার্মানিতে বেকারি বেড়েছে ৮.১ শতাংশ হারে। জার্মান সরকার বলছে, ২০১০-এ বেকার হবে ৪৭ লক্ষ, জাপানের বেকারির হার ৪.৪ শতাংশ। ১৯৯৮ থেকে বেকারত্বের জ্বালায় জাপানে ৩০ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে। গত ৩০ বছরে চীনের অর্থনীতিতে আজকের মতো মন্দা চোখে পড়েনি। সেখানে ৬৭,০০০ কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শহরে কর্মচ্যুত ১ কোটি ৮০ লক্ষ। গ্রামীণ বেকার ২০ শতাংশ। ছাঁটাই-এর ফলে লক্ষ লক্ষ মাইগ্র্যান্ট লেবার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জি-৭ দেশগুলোর শিল্প উৎপাদনও ফিরে গিয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সীমানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় এমন দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ বাজার সংকট বা মন্দা আর দেখা যায়নি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আই এল ও-র ডিরেক্টর জুয়ান সোমভিয়ার 'সত্যিকারের বিপদ' সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, 'এই অর্থনৈতিক অধোগতি থেকে কোনও দেশ, কোনও অঞ্চলই রেহাই পাবে না।' রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা (২০১২) শীর্ষক রিপোর্টে বলেছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিকাশের হার

আটের পাতায় দেখুন

পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে রাজ্যে রাজ্যে জনসভা

বাঙ্গালোরে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে
কমরেড মানিক মুখার্জীর ভাষণ

পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাঙ্গালোরের শেষাদ্রিপুরমে বরোদাচার মেমোরিয়াল হলে ২৬ এপ্রিল একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। তিনি বলেন, এই দিনটি সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। সারা দেশের কমরেডরা এদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে আরও ভালো করে উপলব্ধি করার এবং এর ভিত্তিতে বিপ্লবের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম তীব্রতর করার শপথ গ্রহণ করেন।

সেই ১৯৪০ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে, অবিভক্ত সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি এবং তখনকার অন্যান্য তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির মতোই এটি একটি সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করা এবং এস ইউ সি আই (সি) -কে একটি সঠিক সাম্যবাদী দল হিসাবে গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি এ দেশে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইনটি নির্ণয় করেন। আমাদের দলের জন্মলগ্ন থেকেই দলের নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত মান ক্রমাগত উন্নত করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। সেই কারণে শুরু থেকেই জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে তিনি দলের মধ্যে একটা সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সূচনা করেন — যাতে যৌথ জীবনযাপনের একটা ভিত্তি তৈরি হয় এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য যৌথ চিন্তাপদ্ধতির জন্ম হয়। তিনি বারবার বলেছেন যে, একটি কমিউনিস্ট পার্টির মেরুদণ্ড হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ক্রিয়াশীল হতে পারে না যদি কমরেডদের চেতনার মান নিচু হয়। সেইজন্য একটি বিপ্লবী দলের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হল, আদর্শগত ও রাজনৈতিক মান ক্রমাগত উন্নত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে জীবন্ত রাখা। এই মানোন্নয়ন নির্ভর করে নেতা-কর্মীরা কত গভীরভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করতে ও তাকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারছেন তার ওপর। যাঁরা এই সংগ্রামে সফল হবেন কেবলমাত্র তাঁরাই বিপ্লবের মশালবাহক হতে পারবেন। তা ছাড়া, নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে উপলব্ধির স্তরের মধ্যে ফারাক যদি বাড়তে থাকে, তাহলে সমচিন্তাপদ্ধতি, সমচিন্তা, সমবিচারধারা এবং সমউদ্দেশ্যমুখীনতা গড়ে তোলার যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার পরিবর্তে যান্ত্রিকতার সৃষ্টি হবে — যা অন্ধতার জন্ম দেবে। এটা নেতাদের মানেরও অবনমন ঘটাবে। নেতা-কর্মীদের মানের ফারাক কমানোর অর্থ অবশ্য নেতাদের মানকে কর্মীদের স্তরে নামিয়ে আনা বোঝায় না। বরং কর্মীদের মান ক্রমাগত উন্নত করাকেই বোঝায়। তার মধ্য দিয়ে গোটা পার্টির মানেরই উন্নয়ন ঘটবে।

কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, স্টাডি ক্লাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আদর্শগত সচেতনতা বাড়াবার ওপর বারবার জোর দিয়েছেন। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন, যৌনতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তিনি কমরেডদের উৎসাহ দিয়েছেন, যাতে সর্বদা সম্মিলিত আলোচনা ও সাহচর্যের মধ্য দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানের স্বচ্ছতা আসে। এই পদ্ধতি আমাদের দলে এখনও সজীব। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার অভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে যান্ত্রিকতা আসছে। একে যদি রোধ করা না যায় তাহলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট

বাঙ্গালোরের সভায় কমরেড মানিক মুখার্জী। তাঁর ডাইনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ।

আন্দোলনে গুরুতর সংকট দেখা দেবে। যদিও তখন আমাদের দল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বের দ্বারা স্বীকৃত ছিল না, তবুও কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করতেন এবং আত্মসমালোচনা হিসাবেই এই পশ্চাদপদতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। এবং এই বিশ্বাস নিয়েই তা করেছিলেন, যদি এই বিশ্লেষণের মধ্যে সত্য থাকে, তাহলে ইতিহাস একদিন তার মূল্য দেবে। পরবর্তীকালের ঘটনাবলীতে তা সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষই আধুনিক সংশোধনবাদের উৎসকে চিহ্নিত করেছেন, যা শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে ভিতর থেকে নির্বীর্য করছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করছে। সাথে সাথে কমরেড ঘোষ হামবড়া ভাব বা অহমের বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন, কেন না তা সত্যকে দেখা এবং তা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অন্ধতার সৃষ্টি করতে পারে। শ্রেণিচ্যুত হওয়া এবং বিপ্লব, শ্রেণি ও দলের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের প্রতিও তিনি জোর দিয়েছেন। তিনি বারবার ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেছেন, কেন না পুঁজিবাদের উত্তরোত্তর অবক্ষয়ের ফলে ব্যক্তিবাদের শ্বাসরোধী ফাঁস সমাজে আরও চেপে বসছে। তিনি কতটা সঠিক ছিলেন, তা আমরা আজ সংশোধনবাদের মারাত্মক উত্থান এবং সোভিয়েট রাশিয়া, চীন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর বুঝতে পারছি। আমাদের ভীত হলে চলবে না, সতর্ক হতে হবে। ব্যক্তিবাদ তার কুৎসিত ফণা নানাভাবেই তুলছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য লাগাতার সচেতন সংগ্রাম চালিয়ে না গেলে যে কেউ এই ব্যক্তিবাদের খপ্পরে পড়তে পারেন, এমনকী অজানিতভাবেও। এমনকী একটি মিটিংয়ে বসে যদি আমরা যৌথ সিদ্ধান্ত এবং নিজ মতামতের প্রত্যাখ্যান উভয়কেই সানন্দে গ্রহণ করতে না পারি, তাহলেই বুঝতে হবে আমরা সম্পত্তিবোধ, মিথ্যা অহমিকা এবং ব্যক্তিবাদের শিকার হয়ে পড়ছি। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দূর করার সংগ্রাম এবং আদর্শগত-রাজনৈতিক মানোন্নয়ন খুবই জরুরি। এটা শ্রমসাধ্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। যদি আপনি এই সংগ্রামের নির্যাসকে আত্মস্থ করতে পারেন, তাহলে জীবনের সর্বোত্তম আনন্দ পেতে সক্ষম হবেন।

জনগণের মধ্যে থাকার উপর কমরেড শিবদাস ঘোষ যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কমরেড মানিক মুখার্জী সেই বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনগণের মধ্যে থাকার অর্থ শুধু শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম সংগঠিত করাকেই বোঝায় না। আমরা

পাঁচের পাতায় দেখুন

জেলবন্দি কমরেডরা দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা-কর্মীরা যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৪শে এপ্রিল দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করলেন। কর্মীদের উদ্যোগে কারাবন্দিদের সমবেতে করে ঐ দিন বিকালে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার, কমরেড হরেরাম সরদার, কমরেড সহদেব হালদার ও কমরেড অরবিন্দ হালদার।

সভার সভাপতি ও প্রধান বক্তা সহ অন্যান্য কমরেডরা মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি কমরেড বাঁশিনাথ গায়েন বলেন, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর বাসন্তী নাট্য মন্দিরে কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে আমাদের প্রিয় দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই সমাজ ব্যবস্থায় ভোট দিয়ে কিছুই হবে না, চাই বিপ্লব। শোষণহীন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে চাই যথার্থ বিপ্লবী দল। তাই তিনি বিপ্লবের প্রয়োজনে এই দল গঠন করেছিলেন। কমরেড প্রণব চ্যাটার্জী বলেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করে দেশের অভ্যন্তরে রাজ্যে রাজ্যে আমাদের দলের সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটছে। আগামী দিনে বিপ্লবের প্রয়োজনে ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য এখন নেতা-কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন।

সভার প্রধান বক্তা বিশিষ্ট জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলেন, আমরা কারাভ্যন্তরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীরা নানা অসুবিধার মধ্যেও অন্যান্য বছরের মতো প্রিয় দলের প্রতিষ্ঠা দিবস মহান ২৪শে এপ্রিল উদযাপন উপলক্ষে এখানে মিলিত হয়েছি। তিনি বলেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার স্বার্থে দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার ফলে খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া, ফসলের দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা, খুন, ধর্ষণ, নারীপাচার, শিশুমৃত্যু, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা, দুর্নীতি, নীতি-নৈতিকতার সংকট সর্বক্ষেত্রে আজ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এ সবই হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি চলছে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা। নির্বাচনের দ্বারা সরকারের পরিবর্তন হয়, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন হয় না। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের দ্বারাই তা একমাত্র সম্ভব। দলের প্রতিষ্ঠা থেকেই তাঁরই নির্দেশিত পথে একক শক্তিতে জনজীবনের সকল সমস্যাকে নিয়ে গণআন্দোলন সংগঠিত করা এবং জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও গণআন্দোলনের মূল হাতিয়ার গণকমিটি গড়ে তুলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক সর্বব্যাপক গণআন্দোলনের কাজটি দল করে চলেছে। এই পথেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর নেতৃত্বে বিপ্লব আসবে।

ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে বক্তব্য রাখছেন কমরেড রণজিৎ ধর। পাশে সমাবেশের একাংশ।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পাটনায় সভা

রাজ্যে রাজ্যে পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

চারের পাতার পর

জনগণের কাছে যাই, তাদের সঙ্গেই থাকি, তাদের সংগঠিত করার এবং বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করি। একজনের মার্কসবাদের উপলব্ধির পরীক্ষা হয় তার চরিত্রের সাথে মিশে থাকা সর্বহারা মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জনগণকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা এবং জনতাকে আন্দোলনের তরঙ্গের মধ্যে আনার মধ্যে দিয়ে। আমাদের পার্টি বর্তমানে শুধু সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাই নয়, এটিই একমাত্র শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের পার্টি। জনগণ চাইছে আমরা দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠি। আমরা তাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারি, যদি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলিকে বারবার চর্চা করি এবং সেইমতো আচরণ করতে পারি। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে কথা বহু পূর্বেই বলেছিলেন, বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ সেরকমই অনিরসনীয় সংকটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বিশ্বজুড়েই সাধারণ মানুষ পুঁজিবাদী অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। আমেরিকার জনগণ রাস্তায় নেমে আসছে। স্লোগান তুলছে — পুঁজিবাদ নিপাত যাক। 'ওয়াল স্ট্রিট দখল কর' জাতীয় আন্দোলন গোটা পশ্চিম গোলার্ধকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিম এশিয়াতেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, কায়েমী স্বার্থবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ চলছে। শত চেষ্টাতেও বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম এই আন্দোলনের খবর চেপে রাখতে পারছে না। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই বাস্তব পরিস্থিতি বিপ্লবের জন্য তৈরি, কিন্তু পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য সঠিক বিপ্লবী দলের আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি এখনও সম্পূর্ণ নয়। আমাদের দেশেও এটা সত্য। কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু পূর্বেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এবং যত দ্রুত সম্ভব পার্টির বিস্তার ঘটিয়ে বিপ্লব সংঘটিত করার জায়গায় পৌঁছোনোর জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দ্রুত এই জায়গায় পৌঁছোনোর জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সংকট জর্জরিত মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতার কাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। দুর্নীতি লাগামহীন, সাংস্কৃতিক অধঃপতন, অশ্লীলতা, যৌনবিকৃতি মারাত্মকভাবে বেড়েছে। মানুষ অবসাদ, সিজোফ্রেনিয়ার মতো গুরুতর মানসিক রোগে ভুগছে। শান্তি নেই, আনন্দ নেই, মানবিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়ছে, পরিবারগুলিও ভাঙছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নিকৃষ্ট ভোগবাদ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করছে। চাষিরা আত্মহত্যা করছে, বিরাট সংখ্যক নারীকে গণিকাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে। নারী ও শিশু পাচার ব্যাপকহারে বাড়ছে। বিপ্লবীরা ছাড়া জীবনে কেউ স্বস্তিতে নেই। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করলে এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। পুঁজিবাদের সমর্থকরা সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, বলছে এই মতবাদ সেকেলে, অচল। কিন্তু সত্য হল অন্যরকম। সমাজতন্ত্র এই সমস্ত ব্যাধি ও নৈতিক বিচ্যুতি থেকে মানুষকে মুক্ত করেছিল। কমরেড মানিক মুখার্জী তাঁর সাম্প্রতিক সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া সফরের উল্লেখ করে বলেন, 'বেকারি' শব্দটি সে দেশের মানুষের কাছে অপরিচিত। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাতাবরণ খুবই সুন্দর। কোনও দিকেই কোনও কুরুচির চিহ্ন নেই। সে দেশে পা দিলেই যে কেউ বুঝবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা সেই দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কী রকম পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার করছে।

সবশেষে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন যে, জনগণ আকুলভাবে মুক্তি চাইছে। তারা মরিয়া হয়ে সঠিক পথ খুঁজছে। সমস্ত বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির মুখোশ খুলে গেছে। কেবলমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই মানুষকে পথ দেখাতে পারে। আমাদের দলই তাদের সামনে একমাত্র ভরসা। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা নিয়ে আমরা যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই প্রবল সাড়া পাচ্ছি। যা পাচ্ছি, তাকে বিকশিত ও সুসংহত করা প্রয়োজন। সাথে সাথে দলের মধ্যে পুনরুজ্জীবন ও সংহতকরণের যে সংগ্রাম চলছে, নিজেদের চেতনার মান উন্নত করে তাকে আরও ত্বরান্বিত করা দরকার। ভারতের বিপ্লব সংঘটিত করার এবং বিশ্ববিপ্লবে সহায়তা করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য দ্রুত নিজেদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার অমোঘ অস্ত্রে আমরা সজ্জিত। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।

ঝাড়খণ্ডে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে কমরেড রণজিৎ ধরের ভাষণ

এস ইউ সি আই (সি) প্রতিষ্ঠা দিবস ২৪শে এপ্রিল ঝাড়খণ্ডে মর্যাদার সাথে পালিত হয়। এই উপলক্ষে রাজধানী রাঁচিতে অল ইন্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স হলে ২৫ এপ্রিল এক জনসভা আয়োজিত হয়। সভা পরিচালনা করেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস কে পি সিং, আর এস শর্মা, সিদ্ধেশ্বর সিং, বিমল দাস, সীতারাম টুডু, রামলাল মাহাতো, সুমিত রায়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর।

প্রথমে কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন কমরেড রবীন সমাজপতি। তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ড রাজ্য প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এলাকার সাধারণ মানুষ সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক মহলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার খেলা চলছে। প্রোমোটার, পুলিশ, ক্রিমিনাল ও রাজনৈতিক নেতাদের দুষ্টচক্র উঠে পড়ে লেগেছে গরিব মানুষের বসতি উচ্ছেদ করার জন্য। আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একক শক্তি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের প্রবল সমর্থন পাচ্ছে। এখন আমাদের পুরনো কাজ করার শৈলীকে পাল্টে নতুন করে নিজেদের গড়তে হবে। একটা প্রোগ্রাম করে তারপর দু'দিন বিরাম দেওয়ার অভ্যাস আমাদের পাল্টে ফেলতে হবে।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে গান্ধিজির 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক, জনগণের কাছে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র আহ্বান, দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করতে নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্রমাগত এগিয়ে আসা, জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর গুলিচালনা — সব মিলিয়ে গোটা ভারতবর্ষ সেদিন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলায় আমাদের ছোট শহরেই দেখেছি, প্রায় প্রতিদিন স্কুল-কলেজে ছাত্র ধর্মঘট, মিছিল, থানা আক্রমণ, বিলাতি মদের দোকানে আগুন দেওয়া, পুলিশের গুলি, কার্ফু, সবশেষে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই সারা ভারত পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ কর্মচারীদের ধর্মঘট, বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ ইংরেজ শাসক এবং ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণির মধ্যে প্রবল ভয় ধরিয়ে দেয়। তারা বুঝতে পারে, ঘটনা যদি এভাবেই চলতে থাকে এবং অবিলম্বে কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃত্বের মাধ্যমে কোনও মীমাংসায় পৌঁছোনো না যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব আপসপন্থী নেতৃত্বের হাত থেকে চলে যেতে পারে। ফলে, সাত-তাড়াতাড়ি আপসের মাধ্যমে ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে এবং ভারতবর্ষে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি বলেন, আজ পুঁজিবাদের সংকট সর্বাত্মক। যেদিকে তাকান, শুধুই হাহাকার। শিক্ষার দরজা সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ, উপযুক্ত চিকিৎসা আজ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, বেকারিতে দেশ ছেয়ে গেছে, চাকরি নেই, জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, বুকের সন্তানকে মা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। সব থেকে বড় সঙ্কট হল সংস্কৃতির। চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদ গোটা সমাজকে গ্রাস করেছে। দেশ, সমাজ, পাড়া-প্রতিবেশি তো দূরের কথা, এমনকী এক পরিবারের মধ্যেও প্রত্যেকেই

মধ্যপ্রদেশের গুনাতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশ

শুধু নিজের স্বার্থ দেখছে। তাই দেখুন, কোথাও শান্তি নেই।

এসবের জন্য দায়ী হল পুঁজিবাদ। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, এইসব সমস্যা আরও ভয়াবহ, আরও জটিল রূপ ধারণ করবে। তাই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চাই। শুধু সরকার পরিবর্তন করে এর সমাধান করা যাবে না। একমাত্র বিপ্লবই হল এর সমাধান। কিন্তু আমি বিপ্লব চাই, শুধু এই চিন্তাটা কোনও বিপ্লবী চেতনা নয়। 'আমি বিপ্লব চাই'-এর সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি হল — মজুর শ্রেণির যে পার্টিটা বিপ্লব করবে, আমি সেই পার্টিটাকে শক্তিশালী করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কারণ, বিপ্লবী পার্টি ছাড়া তো বিপ্লব হতে পারে না। কমরেড লেনিন বলেছিলেন, 'উইদাউট এ রেভলিউশনারি পার্টি দেয়ার ক্যান বি নো রেভলিউশন।' আমরা গর্বিত, কারণ মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ হাতে গোনা কয়েকজন সাথীকে নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এদেশে যে সত্যিকারের বিপ্লবী দলটি গড়ে দিয়ে গেছেন, আমরা প্রত্যেকে সেই দলের সৈনিক। কমরেড ধর বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা আজ শুধু দেশের সমস্ত প্রান্তেই নয়, এমনকী বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, আজকের বিশেষ দিনে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নের সাথে সাথে একজন মার্কসবাদী বিপ্লবী হিসাবে আমরা কতটুকু নিজেদের পাল্টাতে পেরেছি, তারও মূল্যায়ন করি। আপনারা অনেকেই ১৪

উত্তরপ্রদেশের বদলাপুরে প্রতিষ্ঠা দিবসে মিছিল

মার্চের দিল্লির ঐতিহাসিক মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। এত বিশাল, প্রাণবন্ত ও সুশৃঙ্খল মিছিল, দিল্লির বুকে ইতিপূর্বে কোনও বামপন্থী দল একক বা যুক্তভাবেও করতে পারেনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারে হাজারে মানুষ দিল্লিতে ছুটে এসেছিল প্রতিবাদ জানাতে। সকলে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, এই প্রতিবাদের ভাষা অন্য ধাঁচের ছিল। আগের রাতে অপ্রত্যাশিত প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উদ্যোক্তাদের সমস্ত আয়োজন বানচাল করে দেয়। বিশাল দেশ ভারতবর্ষের বহু দূর দূরান্ত থেকে দু'তিন দিন ধরে নিদ্রাহীন, অর্ধভুক্ত বা প্রায় অভুক্ত অবস্থায় হাজার হাজার মানুষ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় দিল্লি পৌঁছে কোনও বিরক্তি প্রকাশ দূরের কথা, নিজেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে অবস্থা স্বাভাবিক করতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ দৃশ্য অভূতপূর্ব। একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা এবং আন্দোলনের প্রতি প্রবল আবেগের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই মিছিল থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে দিকে দিকে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কত সমস্যায় মানুষ ভুগছেন। প্রচণ্ড গরমে চারিদিকে জলের হাহাকার, চলার অযোগ্য রাস্তাঘাট, অপরিষ্কার নিকাশি ব্যবস্থা, চিকিৎসা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সরকারি উদাসীনতা — এইসব নিয়ে ব্লক লেভেল থেকে আপনারা আন্দোলন গড়ে তুলুন। কিন্তু তার সাথে সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের কয়েকটি মূল্যবান কথা আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন।

প্রথমত, সর্বহারা সংস্কৃতি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। যত কষ্টসাধ্যই হোক না কেন, কালেকটিভ লাইফ, কালেকটিভ ওয়ার্ক, কালেকটিভ ওয়ে অব থিঙ্কিং— এগুলোকে আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, ছেলেমেয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি —

ছয়ের পাতায় দেখুন

গুজরাটের সুরাটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড ছায়া মুখার্জী। পাশে সমাবেশের একাংশ।

আর্থিক ‘সংস্কারের’ ভাঁওতা

একের পাতার পর

এ সরকারও তার জন্য সমস্ত নিয়ম-নীতি শিথিল করে দিয়ে প্রস্তুতি শেষ করে রেখেছিল। কিন্তু একদিকে প্রবল বিরুদ্ধ জনমত, অপরদিকে আঞ্চলিক দলগুলির বিরোধিতার কারণে (কারণ যা-ই হোক) তা এখনও আটকে রয়েছে। যেমন আটকে রয়েছে ব্যাঙ্ক ও বিমা ক্ষেত্রের সংস্কার। তথাকথিত এই সংস্কার চালু হলে ব্যাঙ্ক-বিমা ক্ষেত্রের দরজাও হাট করে খুলে দিতে হবে বিদেশি তথা মার্কিন পুঁজির জন্য। শুরু হবে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে জুয়া খেলা। শিক্ষা-চিকিৎসায় তারা ইতিমধ্যেই সংস্কারের নামে অবাধ বেসরকারিকরণ ঘটিয়ে তাকে পুঁজিপতিদের অবাধ মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরিণামে শিক্ষা-চিকিৎসা আজ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

‘সংস্কারের’ আরও একটা লক্ষ্য আছে। সেটা হল, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ ভর্তুকি কমিয়ে পুঁজিপতিদের জন্য তার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া। সরকারি মন্ত্রী ও কর্তাব্যক্তিরা, মালিক পুঁজিপতিরা এবং তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যমে ভাষ্য দেওয়া অর্থনীতিবিদরা ভর্তুকি বলতে সাধারণ মানুষের শিক্ষা চিকিৎসা পরিবহণ খাদ্য ইত্যাদিতে সরকারি বরাদ্দ যৎসামান্য অর্থকেই বুঝিয়ে থাকেন। মালিক পুঁজিপতি শ্রেণিকে নানা অছিলায়, নানা নামে সরকার যে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি সারা বছরভর দিয়ে থাকে এঁরা কেউ ঘুণাক্ষরেও তার উল্লেখ করেন না। সেগুলোকে এঁরা কখনও বলেন ‘স্টিমুলাস’, কখনও বলেন ‘রিকভারি’, কখনও বা শুধুই ‘পাশে দাঁড়ানো’। ২০০৮ সাল থেকে সরকার বেসরকারি পুঁজি মালিকদের যে পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে চলেছে তার পরিমাণ প্রতি বছরে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা।

এই সংস্কার হলে কী হবে, আর না হলেই বা কী হবে?

১৯৯০-এ এই তথাকথিত সংস্কার শুরু হওয়ার পর আড়াই দশক অতিক্রান্ত। মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, উদারীকরণ, সংস্কারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি আসলে এক নির্ভেজাল ভাঁওতা। এই সংস্কারে লাভ আসলে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির, যারা স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর ধরে দেশের মানুষকে শোষণ করে বিপুল পুঁজির মালিক হয়েছে। সেই পুঁজি বাজারের মরিয়া সন্ধানে একদিকে যেমন সরকারি ক্ষেত্রগুলির দখল নিচ্ছে, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বিশ্বের দেশে দেশে বাজার দখল করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিনিময়ে দেশের বাজার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কাছে খুলে দিতে হবে। যতরকম বিধিনিষেধ একসময় দেশীয় পুজিরই স্বার্থে আরোপ করা হয়েছিল, সংস্কারের নামে সেগুলি তুলে নিতে হবে। প্রচলিত শ্রম আইনে শ্রমিকদের যতটুকু অধিকার রয়েছে, তাকেও বিলুপ্ত করে তাদের আরও অবাধ শোষণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই কাজটিই কেন্দ্রীয় সরকার নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বিচারে সরকারি সম্পত্তি নামমাত্র দামে তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। ছাঁটাই হচ্ছে সাধারণ মানুষের শিক্ষা চিকিৎসা খাদ্যের জন্য সরকারি বরাদ্দ। ফল হিসাবে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের উপর চেপে বসছে। অর্থাৎ এই সংস্কারের দ্বারা মুনাফার পরিমাণ আশ্চর্য দ্রুততায় বাড়িয়ে চলেছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণি, আর সাধারণ মানুষ দারিদ্রের আরও অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের প্রথম দশ জন ধনীর তালিকায় চার জন ভারতীয় স্থান পেয়েছে। তাদের সম্পদের পরিমাণই হচ্ছে (মার্চ মাসের হিসাবে) ৯ লক্ষ কোটি টাকা। ভারতের প্রথম ১০টি ধনী মালিক পরিবারের মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ভারতে বিলিয়নপতির (৫ হাজার কোটি টাকা ও তার বেশি সম্পদের মালিক) সংখ্যাও বাড়ছে। আর দারিদ্রের সীমারেখা ক্রমাগত নীচে নামিয়েও ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের প্রকৃত চিত্রটা

সংস্কার বলতে আমরা বুঝি, জীর্ণ, ভাঙাচোরা কোনও কিছুকে মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। অথচ বাস্তবে সংস্কার এই জীর্ণতাকে বাড়িয়েই তুলছে। সংস্কারের নামে তারা আজ যা করছে তা হল, শিল্প-কৃষি-শিক্ষা-চিকিৎসা-পরিষেবা সহ নানা ক্ষেত্রে সরকারি যে নিয়ন্ত্রণ এতদিন চালু ছিল, তা শিথিল অথবা বাতিল করে দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের দরজা অবাধ করে দেওয়া। তার জন্য নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন বদলানো। এরই নাম দেওয়া হয়েছে সংস্কার।

কোনও মতেই ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না।

এই সংস্কারের দ্বারা মালিক পুঁজিপতি শ্রেণিই কি তাদের বাজার সংকট থেকে রেহাই পাবে?

পাবে না। যদি পেত তবে আমেরিকা ইউরোপের আজ এই ভয়ঙ্কর দশা হত না। খোদ আমেরিকা তো পুঁজিবাদের শিরোমণি, সংস্কারের তারাই তো চূড়ামণি। তাদের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই তো সংস্কারবাদী অর্থনীতির মূর্ত রূপ। সেখানে তো প্রায় সব কিছুই বেসরকারি মালিকদের অধীন। তবে কেন ২০০৮ সালের মন্দায় সবার আগে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মার্কিন অর্থনীতিই? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই ঋণের বোঝা প্রায় ১৫ লক্ষ কোটি ডলার। এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণই ৪.৫ লক্ষ কোটি ডলার। যে মার্কিন মূল্যায়ন সংস্থাগুলি ভারতের রেটিং কমিয়ে সংস্কারের জন্য চাপ দিচ্ছে, তারা তো আমেরিকার ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা মানও (রেটিং) ‘এএএ’ থেকে কমিয়ে করেছে ‘এএ+’। কোন সংস্কারের অভাবে তা ঘটল! আজও পেরেছে নাকি তারা সেই মন্দা সামাল দিতে? ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তাদের সেবাদাস সরকারি মন্ত্রী ও কর্তাব্যক্তিরা এখানেও সংস্কারের জন্য যে আকুলি-বিকুলি করছেন তা কিন্তু জনগণের মঙ্গলের দোহাই দিয়েই। তা হলে এই নীতিতে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মঙ্গল হল না কেন? কেন আমেরিকা জুড়ে হু হু করে বাড়ছে ছাঁটাই, বেকারি? কেন দিন দিন বাড়ছে শ্রমিক বিক্ষোভ? এই নীতিতে রেহাই পেয়েছে নাকি সে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি? বাজারের সন্ধানে এই ক'বছরে অনেক ছোটাছুটি তো করলেন ওবামা, হিলারিরা! এমনকী কলকাতাতেও ছুটে আসতে হল হিলারিকে মার্কিন বিনিয়োগের উমেদারি করার জন্য।

ইউরোপও বেসরকারিকরণ ও খোলাবাজার অর্থনীতির ঢাক পিটিয়েছে। আজ সেই ইউরোপের কী দশা? মন্দার আতঙ্কে কাঁপছে গোটা ইউরোপ। আজ গ্রিস হুড়মুড়িয়ে পড়ছে তো কাল ইতালি, তো পরের দিন স্পেন অথবা আয়ারল্যান্ড। একই দশা ইংল্যান্ডের। ২০০৮ এর মন্দা আবার ফিরে আসছে ইউরোপ জুড়ে। ইউরোপের প্রতিটি সরকারই এর বোঝা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইছে। ফল হিসাবে ঘটছে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, চলছে বেতন কমানো, পেনশন ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে সংকোচন ঘটানো, হু হু করে বাড়ছে বেকারি। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক বছর কোনও দল নির্বাচনে জিতে এলে, পরের বছরই তাদের গদি টলমল করে উঠছে।

অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজেরই তৈরি এই সংকট থেকে রেহাইয়ের কোনও রাস্তা আজ আর খোলা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সংকটকে বলা হত এবেলা-ওবেলার সংকট। আর এখন তা পৌঁছে গেছে প্রতি মুহূর্তের সংকটে। কোনও টোটকা, কোনও জড়িবুটিতেই যে পুঁজিবাদের আয়ু আর বাড়ানো সম্ভব নয়, তা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।

তবুও ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের ম্যানেজার কংগ্রেস-বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা সংস্কারের মধ্যেই রেহাইয়ের রাস্তা খুঁজতে চাইছে। যা আসলে ভারতেও পুঁজিপতিদের লাভের পরিমাণ অটুট রাখতে মন্দার বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। জনগণের টাকা জনগণের পিছনে ব্যয় না করে পুঁজিপতিদের পিছনে ব্যয় করার নাম দিয়েছে তারা ব্যয় সংকোচ। ভরতুকি কমিয়ে, তেলের দাম বাড়িয়ে, জনগণের উপর আরও ট্যাক্স চাপিয়ে, আরও বেশি বেশি জনগণের সম্পত্তি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়ে, আরও বেশি বেসরকারিকরণ ঘটিয়ে সংকটের হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছে তারা। অথচ আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলির উদাহরণ দেখিয়ে দিয়েছে যে এ পথে এই সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বরং তা দেশের অর্থনীতিকে অধিকতর সংকটের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

মনে রাখতে হবে যত দিন এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থাকবে ততদিন এই সংকট তার পিছু ছাড়বে না, আর দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের সেবাদাস সরকারগুলি চাইবে সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। এই সংকটের হাত থেকে দেশের জনগণকে যদি রেহাই পেতে হয় তবে পুঁজিপতি শ্রেণি তথা সরকারের এই সংস্কার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বদলাতে হবে সমস্ত সংকটের উৎস শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে। সরকারের পরিবর্তনের দ্বারা, অর্থাৎ বুর্জোয়াদেরই স্বার্থরক্ষাকারী একটি দলের পরিবর্তে আর একটি দলকে সরকারে বসিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। চাই সঠিক নীতি ও সঠিক নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সহ সমস্ত স্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক গণআন্দোলন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযানের বিরাট সমাবেশে এই গণআন্দোলনেরই ডাক দিয়েছেন। আসুন, সেই আন্দোলনকে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দিই। আওয়াজ তুলি, সভ্যতার ইতিহাসে পুঁজিপতি শ্রেণিই শেষ কথা বলবে না, বলবে সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শোষিত জনগণ।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সভা

পাঁচের পাতার পর

সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বহারা সংস্কৃতি প্রতিফলিত হচ্ছে কি না দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পার্টি সংগঠন পরিচালনা ও ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সঠিক সর্বহারা শ্রেণির দলের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। পার্টি বডিগুলোতে প্রত্যেক সদস্যের নিজের মতামত রাখার এবং তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যেমন অধিকার আছে, তেমনি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর তা খুশি মনে প্রত্যেকের মেনে চলাই একটি সর্বহারা শ্রেণির দলের সঠিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়া। তাছাড়া পরস্পর তর্ক-বিতর্কের লক্ষ্য কখনই নিজের মত অপরের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত নয়। বরং সত্যে পৌঁছোবার জন্য অপরের যুক্তি উত্থাপনের মধ্যে যদি কোথাও সামান্যতম সত্যও থেকে থাকে, তা গ্রহণ করার মতো মন থাকা চাই।

তৃতীয়ত, নেতৃত্বের সাথে কর্মীদের এবং কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিক হতে হবে। প্রত্যেককে অন্ধতাপূর্ণ যান্ত্রিক আচরণ থেকে মুক্ত হতে হবে। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির যান্ত্রিক সম্পর্কের ক্ষতিকারক দিকের কথা সেই ১৯৪৮-এ কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তা মর্মান্তিক সত্যে পরিণত হয়।

চতুর্থত, আমাদের মনে রাখতে হবে, যত বড় মানুষই হোন না কেন, সমস্ত মানুষই দোষ-গুণ মিলিয়ে মানুষ। অপরের দোষ নিয়ে খোঁচাখুঁচি না করে তার গুণটাকে বাড়াতে পারলেই তার দোষ আপনা থেকেই কমে যায়। এছাড়া আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের কথা না ভেবে অপরের কথা ভাবি, আর নিজের ভাবনাটা অপরের ওপর ছেড়ে দিই, তাহলে ব্যক্তিবাদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এগুলি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, যেমন আমি বুঝেছি। কমরেড শিবদাস ঘোষের এমন আরও বহু শিক্ষা রয়েছে।

আজ আমাদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মুখোশ আজ খুলে পড়েছে। বিজেপি, কংগ্রেস, আর জে ডি, সমাজবাদী দল, জে এম এম প্রভৃতি চিহ্নিত বুর্জোয়া শ্রেণির দলগুলি তো বটেই, এমনকী মার্কসবাদের নাম নিয়ে চলা সিপিআই-সিপিআইএম-এর মতো দলগুলি সম্পর্কেও জনগণ আজ মোহমুক্ত। এরা আজ পুঁজিবাদের দালালি করছে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে মানুষ সি পি এমের নগ্নরূপটা দেখেছে। এছাড়া মাওবাদী নাম নিয়ে যে পার্টিটা আছে, কাগজে-পত্রে তাদের খুব প্রচার থাকলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাছাড়া, চীনের নকল করে এদেশে বিপ্লব হবে না। নকল করে কোনও দেশে কোনওদিন বিপ্লব হয় না। প্রতিটি দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই দেশের বিপ্লবের বিশেষ লাইন নির্ধারণ করতে হয়। তাছাড়া, এ যুগটা এখনও লেনিন বর্ণিত ‘সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবে’র যুগ। ফলে মাওবাদ বলে কিছু হয় না। এ কথা ঠিক, মাও সে-তুং তাঁর দেশে বিপ্লব করতে গিয়ে মার্কসবাদের জ্ঞানভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তাই আমরা সেটাকে বলি, মাও-এর চিন্তাধারা, যেমন আমরা বলি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা।

সবশেষে তিনি বলেন, আজ যদি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে নিজেদের গড়ে তুলতে পারি এবং এগিয়ে যেতে পারি, তবে বিপ্লব বেশি দূরে নেই।

শিক্ষায় দলতন্ত্রের অবসান কী উপায়ে

কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শাসক দল পুষ্ট ১১ জন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠিতে সরাসরি অভিযোগ জানানোর ঘটনায় শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও তার দুর্বৃত্তায়নের প্রশ্নটি আবার সামনে এসেছে। ইতিমধ্যে ওই কলেজেরই সান্ধ্য বিভাগের অধ্যক্ষ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে কলেজে বহিরাগতদের নিয়ে এসে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ জানিয়ে কলেজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করায় শিক্ষানুরাগী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে কলেজ খোলার কথা বলতে হয়েছে। ইতিমধ্যে ভাঙড় কলেজ ও আরামবাগ কলেজ সহ আরও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলতন্ত্রের যে উগ্র চেহারা দেখা যাচ্ছে তাতে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বিগ্ন শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষানুরাগী মানুষ এবং সচেতন ছাত্রসমাজ। এই সুযোগে সিপিএম, কংগ্রেস নেতারা সাধুপুরুষ সেজে ভাষণ দিচ্ছেন এবং কিছু বৃহৎ সংবাদমাধ্যম ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি করার উপরেই বিধিনিষেধ চাপাবার জন্য সওয়াল করছে। মানুষের মনে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি ধাক্কা দিচ্ছে তা হল, সিপিএম জমানার সেই একই চিত্র পরিবর্তিত সরকারের আমলেও পুনরাবৃত্ত হচ্ছে কী করে? এই দাপট, দাদাগিরি এবং দলতন্ত্রের পরিবর্তনেরই তো প্রতিশ্রুতি ছিল!

নিছক কলেজ ইউনিয়ন দখলদারির জন্য এদের এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ কী? স্নাতক স্তরে ছাত্রদের পছন্দমতো বিষয়ে ভর্তি হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় প্রথম বর্ষে ভর্তি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাজার হাজার টাকা আদায় করে শাসকদলের মদতপুষ্ট ইউনিয়ন দাদারা। এই রোজগারের অন্যতম গ্যারান্টি হল কলেজের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখা। প্রায় সমস্ত কলেজেই 'দাদা'দের খুশি না করে ভর্তি হওয়া যে সম্ভব নয় এ কথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার টাকা আদায় করে এই সব ইউনিয়ন 'দাদা'রা। দেখা যায় এই সময় কলেজে 'দাদা'র সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায়। সারা বছরে যাদের কলেজ চত্বরে কোনওদিন পা দিতে দেখা যায় না, তারাও হাজির হয়ে যায় দু'পয়সা পকেটস্থ করার লোভে। কলকাতার বহু কাউন্সিলরও আসরে নেমে পড়েন। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এতদিন এই মধুভাণ্ডের দখল ছিল সিপিএমএর হাতে। তাই স্থানীয় মস্তানরাও ছিল তাদের ছত্রছায়ায়। এখন তারা শিবির পাল্টেছে। পছন্দমতো কলেজ ও বিষয়ে সন্তান যাতে পড়ার একটু সুযোগ পায় তার জন্য কত পিতামাতা তাঁদের ছেলের বয়সী ইউনিয়ন 'দাদা'দের পা ধরে কাঁদছেন— এমন দৃশ্য খুব বিরল নয়। কলেজের খ্যাতি অনুযায়ী ঠিক হয় 'তোলা'র পরিমাণ। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদও একই পথের পথিক। কংগ্রেস, সিপিএম দু'দলের মধ্যে এই নিয়ে বহু মারামারি হয়েছে। এই লড়াইয়ের মধ্যে পড়েই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনের রাস্তায় মেধাবী ছাত্রী মধুমিতা মিত্রের প্রাণ গিয়েছিল বোমার আঘাতে। সিপিএম তথা এস এফ আই একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার পর এই সন্ত্রাস চলেছে নীরবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সব দেখেও চোখ বন্ধ করে থেকেছেন। শুধু তাই নয়, কলেজের অধ্যক্ষদের এলাকার ভাগ অনুযায়ী সিপিএম, কংগ্রেস নেতাদের দরবারে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পড়ত। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছাত্র পরিষদ এবং এসএফআই উভয়ের হাতেই ছাত্র সংগঠন এআইডিএসওর অসংখ্য কর্মীরা কলেজগুলিতে রক্তাক্ত হয়েছে বারবার। সিপিএম দলের বাঁধুনি এবং নেতাদের ধূর্ততা কংগ্রেস বা তৃণমূলের তুলনায় বেশি হওয়ার ফলে তারা অনেক নিখুঁত পরিকল্পনা করে 'তোলা'র ভাগ বাঁটোয়ারা করত। সন্ত্রাস চালাত ঠাণ্ডা মাথায় লোকচক্ষুর আড়ালে। এমনকী '৯০-এর দশকের শেষ দিকে এআই ডিএসও-র দুজন কর্মীকে এসএফআই-এর ছেলেরা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মধ্যে অমানুষিক ভাবে পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেলেও সরকারের সেবাদাস পুলিশ বা সিপিএমের আজ্ঞাবহ তৎকালীন অধ্যক্ষ অভিযোগটুকুও গ্রহণ করেননি। এভাবেই চলেছে বছরের পর বছর। তৃণমূল এখনও সেই কৌশল অর্জন করতে পারেনি বলে বহু কিছু সামনে এসে যাচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা যে অনভিপ্রেত তা দলমত নির্বিশেষে সকলেই বলছেন। কিন্তু এর শেষ কোথায়? সংবাদমাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব সমস্যার কারণ হিসাবে ছাত্র- শিক্ষকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণকেই তুলে ধরা হচ্ছে। সাধারণ মানুষও এইসব কার্যকলাপ দেখে বিরক্ত হয়ে অনেক সময় ভাবেন রাজনীতি থেকে ছাত্র শিক্ষকদের দূরে রাখতে পারলেই বোধহয় আর এমন ঘটবে না। সত্যিই কি তাই? সিপিএম ক্ষমতায় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী দলতন্ত্র কায়েম করেছিল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা উপাচার্য থেকে শুরু করে দারোয়ান নিয়োগ পর্যন্ত সিপিএম সদর দপ্তরের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হত। তৃণমূল নেতারা এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন, দলতন্ত্রের অবসান ঘটানো হবে। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ এই ঘোষণায় খুশি হয়েছিল। কিন্তু দলতন্ত্র নির্মূল করার দাওয়াই হিসাবে তাঁরা যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা আরও মারাত্মক। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত কমিটি গঠন করার প্রক্রিয়াকেই বন্ধ করা হচ্ছে। সরকার আইন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যরা সরকার নিযুক্ত কমিটি দ্বারা মনোনীত হবেন। স্কুল কলেজ পরিচালন কমিটিগুলির নির্বাচন প্রক্রিয়াও সরাসরি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত কিছুতে সরকারের হস্তক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে নতুন মোড়কে দলতন্ত্র কায়েম হচ্ছে। সিপিএম দল সরকারে বসেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কমিটিগুলিকে ভেঙে দিয়ে দলীয় লোককে বসিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকারও ক্ষমতায় এসে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় দলীয় লোককে বসিয়ে দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত কমিটির ক্ষমতা খর্ব করে সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনকেও সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে। ব্রিটিশ সরকার যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার চাইত না, স্বাধীন ভারতেও সরকার কতৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার বারবার লংঘিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করেছে। নির্বাচিত কমিটি এবং ছাত্রদের রাজনীতির নামে ব্যবহার করা হয়েছে নীতি-আদর্শ বিবর্জিত ক্ষমতালিপ্সু নেতাদের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করার হাতিয়ার হিসাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার, শিক্ষক শিক্ষিকাদের সচেতন রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা এবং ছাত্রদের রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশ নেওয়া আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ। কংগ্রেস বিজেপির মতো বৃহৎ বুর্জোয়া দলগুলি তো বটেই, তথাকথিত বৃহৎ বামপন্থী দল সিপিএমও এই রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বলতে নীতি-আদর্শহীন দলবাজি করিয়েছে। সংসদীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস বা সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের যতই বিরোধিতা থাক রাজনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তারাও এর ব্যতিক্রম নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতির চর্চা হয়েছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দিনগুলিতে। সেই উত্তাল সময়ে শিক্ষক ছাত্ররা বহু সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাঁরাই। রাস্তায় ব্যারিকেড ফাইটে অংশ নিয়েছেন যে ছাত্র-শিক্ষকরা, তাঁদের অনেকেই পড়াশোনাতেও ছিলেন সেরা। দেশের কর্ণধার কংগ্রেস এবং মেকি বামপন্থী দলগুলি রাজনৈতিক লাইনের দিক থেকে দেউলিয়া হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের রেশ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি, দেশে দেশে মুক্তিসংগ্রামের, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের কাহিনী ছাত্র-শিক্ষকদের আদর্শের কথা ভাবাত। কলেজ ইউনিয়ন দখল করে টাকা রোজগার করব এই কথা তারা ভাবতেও ঘৃণা করত। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে দেশের শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির মদতপুষ্ট এই রাজনৈতিক দলগুলি ভ্রান্ত এবং নীতিহীন রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়ে সমস্ত নীতি-আদর্শকেই জলাঞ্জলি দিয়েছে। যেন তেন প্রকারেণ গদি দখলই তাদের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। পচাগলা পুঁজিবাদী এই সমাজের রক্ষক হিসাবে কাজ করলে এর থেকে বেশি কিছু হওয়া সম্ভবও নয়। তাই তাদের সংস্পর্শে যে মানুষগুলি আসছে তারাও হয়ে উঠছে নীতি-আদর্শ বিবর্জিত ক্ষমতালিপ্সু নেতাদের হাতের পুতুল। তারই হাত ধরে শিক্ষাঙ্গন হয়ে উঠেছে দুর্বৃত্তদের আখড়া। রাজনীতি থেকে গা বাঁচিয়ে চললে এর হাত থেকে মুক্তি নেই। দুর্বৃত্তায়নকে নির্মূল করে শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা ও পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে দরকার সঠিক নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে সঠিক রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলন। এছাড়া অন্য সব পথই ভ্রান্ত।

বড় গভীর এ অন্ধকার!

আলো ঝলমলে কলকাতা মহানগর। আকাশছোঁয়া বহুতল, বিলাসবহুল হোটেল-রেস্তোরাঁ, ফ্লাইওভার, শপিং মলে সুসজ্জিত। কিন্তু এসবের আড়ালে নিকষ অন্ধকারে মুখ ঢেকে পড়ে রয়েছে যে অন্য এক কলকাতা, কে তার খবর রাখে! ক'জন জানে, সন্ধ্যা নামলেই ফুটপাতে পেতে রাখা ঝুপড়ির সংসারগুলোর আশেপাশে ঘুরঘুর করে হায়নার দল! লোভে জিভ লকলক করে তাদের। রাস্তার না খেতে পাওয়া অভাবী শিশুগুলোকে খাবারের লোভ দেখিয়ে, খেলনার টোপ দিয়ে একবার যদি হাতের মুঠোয় আনা যায়, তাহলেই কেল্লা ফতে! মানুষের চেহারাধারী যে পিশাচরা বিকৃত যৌনক্ষুধা নিয়ে হোটেলে হোটেলে অপেক্ষা করছে, হাতে তাদের মোটা টাকার বাণ্ডিল। সোল্লাসে সেগুলো তারা দেদার ছুঁড়ে দেবে এইসব দালালদের দিকে, লোভনীয় কচি শরীরগুলোর বিনিময়ে। নিশ্চুপে লুঠ হতে থাকবে ফুটপাত-শিশুর বিপন্ন শৈশব।

সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে এই শিউরে ওঠার মতো খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এই কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থল ভিড়ে ঠাসা নিউ মার্কেট এলাকা থেকে অবাধে পথশিশুদের নিয়ে গিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে ধনকুবের কিছু দেশি-বিদেশি পর্যটকের হাতে, তাদের বিকৃত যৌনলালসা চরিতার্থ করতে। শিশুগুলির বয়স পাঁচ-ছয় বছর, কখনও বা আরও কম। আরও মর্মান্তিক বিষয় হল, বাচ্চাগুলির বয়স এতই কম যে তারা এমনকী বুঝতেও পারে না, তাদের নিয়ে কী করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি তাদের সামনে রাখা হয় এমনভাবে, যেন এ হল নিছক একটা খেলা। সে রকমই বলেছে যৌনলালসার শিকার একটি শিশু। সে বলেছে, "ওরা প্রায় দিনই আমাকে আর আমার বন্ধুদের হোটেলে কিংবা গেস্ট হাউসে নিয়ে যায়, সেখানে ওদের সঙ্গে আমরা খেলা করি। ওরা আমাদের অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস করতে বলে। সে সব হয়ে গেলে আমাদের খাবার দেয়, খেলনা দেয়, কখনও কখনও টাকাও দেয়।" একটি ছোট্ট মেয়ে বলেছে, "ওরা আমাকে টাকা দেয়, তার বদলে ওরা যাতে খুশি হয়, আমি তাই করি"।

শহর কলকাতা বুঁদ হয়ে থাকে আলোর নেশায়। আর সেই রোশনাইয়ের আড়ালে আবডালে ঘিঞ্জি গলিঘুঁজিতে ফ্লাইওভারের নিচে আবছা আঁধারে একটু ভালো খাবার, একটা পুতুল, গোটাকয়েক টাকার টোপ বাড়িয়ে ধরে বিকৃতকাম কিছু ধনী। লালসার ছিপে গেঁথে নিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে খায় পথশিশুদের ছেলেবেলার নির্মলতা। সরকার বিপুল টাকা খরচ করে রঙ পাল্টায় সমস্ত সরকারি ঘরবাড়ি, এমনকী গাছের গুঁড়িরও। আর শহরের ফুটপাত-সন্তান তলিয়ে যেতে থাকে পচা গলা সমাজের দুর্গন্ধভরা পাঁকের নিচে।

পুলিশ দপ্তর এ কথা জানে না এমন নয়। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি বলে তারা নাকি নিরুপায়! সত্যিই তো, রাস্তার ধুলোয় জন্মে রাস্তাতেই কাটে যাদের জীবন, সেই সব শিশুদের রক্ষা করার দায় তাদের আছে নাকি! বিশেষত, যখন তাদের ঘিরে জমে উঠেছে রমরমা নরমাংসের ব্যবসা! ফলে সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে ফুটপাতের শিশুরা। চরম গরিবি এমনিতেই নখ-দাঁত বাড়িয়ে রয়েছে এদের জীবন থেকে মাধুর্যের শেষ কণাটুকুও কেড়ে নিতে। থাকার ঘর নেই, নেই দু'বেলার নিশ্চিন্ত খাবার। পড়াশোনার সুযোগ দূরে থাক, আস্ত একটা নতুন জামাও জোটে কচ্চিৎ-কদাচিত। স্নেহ-ভালবাসা এসব শিশুর কাছে আকাশের চাঁদের মতোই। জীবনসংগ্রামে হারতে বসা বদমেজাজি মা-বাপের হাতে মার খেতে খেতে আর গালমন্দ শুনতে শুনতেই বড় হয় এরা। তবু প্রকৃতির নিয়মে এদের জীবনেও শৈশব আসে কিছুটা হলেও নির্মলতা, হাসি-আনন্দ নিয়ে। সেটুকুকেও নিঃশব্দে খুন করে চলে বিকৃত মানসিকতার কিছু ধনী। এদের পৃষ্ঠপোষকতা করার লোকের অভাব নেই, কিন্তু অভাব রয়েছে চূড়ান্ত দরিদ্র, অসহায় শিশুগুলিকে রক্ষা করার মানুষের। তাই নিজেদের অজান্তেই এইডস সহ নানা যৌনরোগের শিকার হয় এরা। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজ-এর করা একটি সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, কলকাতা শহরের পথশিশুদের অবিরত বিকৃত যৌনলালসার শিকার হওয়ার চিত্র। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ শহরের অনেক পথশিশু এইডসে আক্রান্ত এবং নানা যৌনরোগে ভুগছে। শুধু শারীরিক রোগই নয়, শৈশবে এভাবে বিকৃত যৌনাচারের শিকার হওয়ার কারণে এরা কেউই সুস্থ মন নিয়ে বড় হতে পারবে না। ভবিষ্যৎ জীবনে এরা নিজেরাই হয়ত হয়ে উঠবে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন এক একটি নরদানব। নষ্ট করবে আরও বহু নিষ্পাপ শিশুর জীবন।

বিকৃত যৌনতা থেকে পথশিশুদের দূরে রাখতে পুলিশ দপ্তর একটি প্রকল্প চালু করেছে। এখানে নাকি পথশিশুদের নিজেদের যৌন-নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি শেখানো হয়। কিন্তু ১২ মাস ৩৬৫ দিন নিছক একটু গরম ভাতের গন্ধ সারাক্ষণ যাদের লোভ দেখায়, হাজার শিক্ষা দিলেও তারা কি বিকৃতকামী ধনীদের এই হাতছানি উপেক্ষা করতে পারবে?

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

ঋণের দায় জনগণের

তিনের পাতার পর

হবে ০.৭ শতাংশ। ২০১১-র ১.৬ শতাংশের থেকে নেমে যাবে। ইউরো জোনে বেকারির হার ১০ শতাংশ। বেহাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, বেকারি, রাষ্ট্রের ঋণ সংকট, এসব থেকে দেশগুলোকে রক্ষা করতে না পারার ফলে ২০১২-১৩তে বিশ্ব অর্থনীতি আরও বিপদ সঙ্কুল হবে। বিশ্বের শ্রমশক্তির ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ কোটি মানুষ যাদের দৈনিক আয় ২ ডলারের কম — উন্নয়নশীল দেশের এই দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের উন্নয়ন আজ একটি চ্যালেঞ্জ। টিকে থাকতে হলে চাই ৬০ কোটি কাজের সৃষ্টি! হায়, 'জবলেস গ্রোথ'-এর অর্থনীতিতে আনতে হবে জবগ্রোথ! পুঁজিবাদের রক্ষক কোনও দল, কোনও সরকার, কোনও জোট, তা চিন হোক, ভারত হোক — ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘোরানোর সাধ্য কারও নেই।

২০০৮ সালে আই এম এফ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিল, 'উৎপাদনে নজিরবিহীন মন্দার মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের'। শক্তিশালী অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলির সরকারের কাছে তারা আবেদন জানিয়েছিল, যাতে অসুস্থ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে তারা বেশি করে 'স্টিমুলাস' জোগায়।

মনমোহন সিং-প্রণব মুখার্জীরা আই এম এফ-এর এই আর্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে পুঁজিপতিদের স্টিমুলাস প্যাকেজ দিচ্ছে। জনতার প্রয়োজনীয় খাত থেকে ভর্তুকি ছাঁটাই করছে। সরকারি ও বেসরকারি ঋণ বাড়ছে, বাড়ছে সুদ এবং সেটা চাপছে জনতার ঘাড়ে। শিল্প-কলকারখানা ছেড়ে পুঁজি ঢুকছে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিষেবা ক্ষেত্রে। ঋণনির্ভর অর্থনীতি এবং পুঁজির বিপুল বৃদ্ধি ও বাজার ক্রমসংকোচন— এটাই হল বর্তমান যুগ বৈশিষ্ট্য। কেন এমন হচ্ছে? মার্কস-এর অপূর্ব এক উক্তিতে তা প্রকাশ হয়েছে। তিনি বলেছেন, The red barrier of capitalist production is capital itself. অর্থাৎ, পুঁজির চরিত্রই পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের পথে বাধা। আর একটা কথাও স্মরণযোগ্য। সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক নেতারা যে বলেন, জাতীয় সম্পদ, জাতীয় আর্থিক উন্নয়ন, মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি — এসবই মিথ্যাচার হলেও একটি নির্ভেজাল সত্য আছে যা প্রকৃতই জনগণের। সেটা কী? The only part of the so called national wealth that actually enters into the collective possession of a modern nation is the national debt. (Marx, Capital. Vol-1),অর্থাৎ সম্পদটা ন্যাশনাল (জনগণের) নয়, ঋণটা ন্যাশনাল এবং সে ঋণ জনগণকেই বইতে হবে। বুর্জোয়া ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছে মহান মনীষীর এই ব্যাঙ্গোক্তি, প্রকাশিত হয়েছে গভীর যন্ত্রণাময় এক ঐতিহাসিক সত্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন

কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, সংগঠনের সদস্যদের ঘন ঘন বদলি, কাজের ক্ষতির অছিলায় মিটিং-মিছিলে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা, সিপিএম আমলে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের অলিন্দে এসএফআইয়ের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে সভার মাইক ভেঙে দেওয়া, বিভিন্ন বিভাগে প্রচারপত্র বিলিতে বাধাদান, নন্দীগ্রাম গণহত্যার পর মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রতিবাদ সভা করার পর অফিসের ফোন থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদককে ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া — এ সব উপেক্ষা করেই কর্মচারী স্বার্থে আপসহীন ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে সি ইউ ই এ। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত এই সংগঠনটিকে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ইউনিয়ন রুম দেয়নি। একদা ৩৫ দিন ধর্মঘটের ঐতিহ্য বহনকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিপিএমের শাসনে কোনও প্রকৃত কর্মচারী আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেওয়া হয়নি। এতদসত্ত্বেও স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শত আঘাত ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই আপসহীন ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তারই ধারাবাহিকতায় সংগঠনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২০১২-এর ২৫ এপ্রিল। সিপিএম আমলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও হলে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু, ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করে এবার কর্তৃপক্ষ এই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে চতুর্থ সম্মেলন করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। সম্মেলনের দিন সকালে শহিদবেদিতে মাল্যদানের পর ঐতিহ্যশালী আশুতোষ হলে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী সহ আমন্ত্রিত ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের প্রতিনিধিতে পরিপূর্ণ হলে মূল বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। সম্মেলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড রাজকুমার বসাক শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণের মোকাবিলায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে কমরেড শুভেন্দু মুখার্জী ও কমরেড অরুণ চন্দ্র দাস।

প্রকাশিত হল

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন

প্রভাস ঘোষ

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

মে দিবসে আই এ সি সি-র আহ্বান

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী ৩০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সংকটের বোঝা মালিকরা দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। লাগাতার আক্রমণে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শ্রমিক শ্রেণি এখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে অসাম্যের প্রতিবাদে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও কর্পোরেট মুনাফা লালসা বন্ধ করার দাবিতে। এবারের মে দিবসে দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণি আবার লড়াইয়ে নামছে। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নিউইয়র্কে সাধারণ ধর্মঘট এবং আরও ১২৫টি শহরে শ্রমিকরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানানো হয়েছে। একটা সময় এসেছিল যখন মে দিবস উৎসব হিসাবে পালিত হত। এখন মে দিবস এসেছে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইয়ের শপথ নেবার দিন হিসাবে। এবারের মে দিবস স্মরণ করিয়ে দেয় মার্কস-এঙ্গেলসের সেই উদাত্ত ঘোষণাকে— 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এবং ' শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারা শ্রেণির হারাবার কিছু নেই।'

মে দিবসে সুরাটে এস ইউ সি আই (সি) এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র যৌথ সভায় আমেরিকার শ্রমিক ও ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সংহতি জ্ঞাপন করা হয়।

১লা মে দিল্লিতে মিছিল

মে দিবসে মেদিনীপুরে সভা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২২৭-৬২৫৯, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in